ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1659-1665
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.387

স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের দর্পণ: ওড়িয়া ছোটগল্পের পঞ্চরত্ন

হায়দার সেখ, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 24.03.2026; Accepted: 28.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The triumphant journey of Odia short stories began with the timeless writings of Fakirmohan Senapati, where social reform and realistic depiction of rural life were the main themes. However, a radical change can be observed in Odia fiction from the middle of the twentieth century. The storytellers of this time did not only paint a picture of the external society, but also took the complexity of the inner being of man, the crisis of existence and the indelible influence of time as the main subject of the story. The research paper under discussion has attempted to make a comparative dissection of human 'memory', 'being' and 'time'in the light of five best stories of five prominent artists of Odia literature—Raj Kishore Pattanayak, Kishori Charan Das, Godavarish Mahapatra, Kalindi Charan Panigrahi and Surendra Mohanti.

'Memory' is the anchor of human existence, which binds him to the past. But time is like a flowing stream, which constantly changes the world known to man. When man's 'being' or self-identity faces a crisis while adapting to this changing world, higher literature is born. In Rajkishore Pattnaik's story 'Fanki', we see how a simple mango tree becomes the holder of a family's memories and how its fall in the storm of time highlights the uncertainty of life. On the other hand, in Kishore Charan Das' story 'Bhanga khelna', a subtle analysis of child psychology shows how the artificiality of the adult world hurts the simple being of a child. Here 'time' is a cruel craftsman who takes away the simplicity of childhood.

Godavarish Mohapatra has skillfully depicted the degradation and struggle of being in the mirror of social reality in his story 'Neela Mastarani'. The tragedy of an educated woman's transformation from a teacher to a washerwoman proves how much social time and reform can degrade an individual's being. Again, in Kalindicharan Panigrahi's story 'MangserBilap', we see a unique moral evolution. There, rising above the relationship between animals and humans, at a special moment in time, how the primitive brutality of man is transformed into a new human being by burning in the fire of regret. Finally, Surendra Mohanty's story 'Kather Ghora'is a tragic tale of searching for the nostalgia or scent of memory of the past while standing on the rough sands of modernity.

Keywords: Odia Short Story, Memoir / Reminiscence, Existentialism, Social Realism, Child Psychology, Human Relationships, Symbolism etc

ওড়িয়া সাহিত্যের বিবর্তনের ইতিহাসে বিংশ শতাব্দী একটি অনন্য মাইলফলক। এই সময়ে ওড়িয়া কথাশিল্পীরা কেবল গ্রামীণ জীবনের স্থবিরতা বা সরল চিত্রায়নে সীমাবদ্ধ থাকেননি, বরং তারা মানুষের মনের

গহীন কোণে থাকা জটিলতা, অস্তিত্বের সংকট এবং সময়ের সাথে সাথে স্মৃতির বদলে যাওয়া রূপকে অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। আলোচ্য পাঁচটি গল্প— 'ফাঁকি', 'ভাঙ্গা খেলনা', 'নীলা মাষ্টারনী', 'মাংসের বিলাপ' এবং 'কাঠের ঘোড়া'— একত্রে পাঠ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি গল্পই এক একটি স্বতন্ত্র দর্পণ। এই দর্পণে কখনও প্রতিফলিত হয়েছে শৈশবের হারানো সারল্য, কখনও সমাজের নির্মম কুসংস্কার, আবার কখনও মানুষের আদিম পাশবিকতার বিপরীতে নৈতিক জাগরণ। স্মৃতির রোমন্থন এই গল্পগুলোর একটি সাধারণ সূত্র,যা বর্তমানের রুক্ষ বাস্তবতাকে সহ্য করার শক্তি জোগায় অথবা সেই বাস্তবতাকে আরও করুণ করে তোলে।

ওড়িয়া সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী'র 'মাংসের বিলাপ' গল্পটি ইকো-ক্রিটিসিজম (Eco-criticism) এবং প্রাণী অধিকারের (Animal Rights) প্রেক্ষাপটে বিচার্য। পিটার সিঙ্গারের মতে, প্রাণীদেরও নৈতিক মর্যাদা রয়েছে। এখানে জলি ও ডোরার বন্ধুত্ব ডারউইনীয় 'সারভাইভাল অফ দ্য ফিটেস্ট' তত্ত্বকে ভুল প্রমাণ করে এক নতুন 'মেটামরফসিস' বা রূপান্তরের ইঙ্গিত দেয়। তিনি 'মাংসের বিলাপ' গল্পের মাধ্যমে এমন এক জগতের দ্বার উন্মোচন করেছেন, যেখানে প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি আর মানুষের অর্জিত কুপ্রবৃত্তি এক বিশাল সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। এই গল্পের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে এক অনন্য বন্ধুত্ব—একদিকে সুদূর লন্ডন থেকে আসা মাংসাশী শিকারি কুকুর 'ডোরা', অন্যদিকে ওড়িশার গভীর অরণ্যে জন্ম নেওয়া নিরামিষাশী কৃষ্ণসার হরিণ 'জলি'। লেখক গল্পের শুরুতেই এই দুই অসম সত্তার পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন, "জলি ওডোরা আবাল্য সঙ্গী। ক্ষণেক একে অপরকে ছাড়িয়া থাকিতে সহজে রাজি হয় না।"[১] এই উদ্ধৃতিটি কেবল তাদের বন্ধুত্বের গভীরতাই প্রকাশ করে না, বরং প্রকৃতির আদিম নিয়ম— শিকারী ও শিকারের যে চিরন্তন সম্পর্ক— তাকে এক আশ্চর্য মানবিক আবেদনে অস্বীকার করে।

গল্পের প্রেক্ষাপটটি গড়ে উঠেছে স্মৃতি ও সত্তার এক বিমূর্ত বুননে। ডোরা এবং জলির এই বন্ধুত্ব আমাদের শেখায় যে, প্রেম ও মমত্ববোধ কোনো ভৌগোলিক সীমা বা খাদ্যাভ্যাসের দাস নয়। যখন ডোরার পা জখম হয়, তখন জলি তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকে এবং লেখকের ভাষায়— "তার পায়ে মুখ-স্পর্শ করিয়া কোথায় তার ব্যথা তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিল।"[২] এই যে প্রাণীর অন্তরের মমতা, তা মানুষের তথাকথিত শ্রেষ্ঠত্বের দাবিকে বড় ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলে দেয়। ডোরার সত্তা এখানে বদলে গেছে; সে শিকারি থেকে রক্ষক হয়ে উঠেছে। কিন্তু সময়ের ট্র্যাজেডি শুরু হয় যখন এই পবিত্র সম্পর্কের মাঝে মানুষের লালসা ও শিকারি প্রবৃত্তি প্রবেশ করে।

জমিদার বাবুর শিকারে জলির মৃত্যু এই গল্পের সবচেয়ে অন্ধকার দিক। জলি যখন মারা যায়, তখন ডোরা কেবল তার বন্ধুকে হারায়নি, তার অস্তিত্বের এক বড় অংশও হারিয়ে ফেলে। কিন্তু গল্পের প্রকৃত দর্শন ফুটে ওঠে যখন জমিদারের 'সত্তা'র পরিবর্তন ঘটে। শিকারি হিসেবে জলিকে ভক্ষণ করার পর তাঁর ভেতরে যে মানসিক প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, তা লেখক অত্যন্ত নিপুণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। জলির সেই পবিত্র মাংস যখন জমিদারের শরীরে প্রবেশ করে, তখন তা পুষ্টির বদলে এক তীব্র দহন তৈরি করে। লেখক বলছেন— "হরিণ শাবকের প্রতিটি ভুক্ত মাংসখণ্ডের ক্রন্দন তাঁর প্রতি রোমকূপ হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছে তিনি শুনিতে পাইলেন।"[৩] এই 'মাংসের বিলাপ' আসলে মৃত জলির কোনো আর্তনাদ নয়, বরং জমিদারের সুপ্ত বিবেকের এক তীব্র দংশন। স্মৃতি এখানে অপরাধবোধের রূপ নিয়েছে, যা জমিদারের বর্তমান সত্তাকে তিলে তিলে ধ্বংস করে নতুন এক সত্তার জন্ম দিচ্ছে।

জমিদার বাবুর দুই সপ্তাহব্যাপী সেই মারণোত্তর জ্বর এবং অনাহার আসলে তাঁর পাপের প্রায়শ্চিত্ত। সুস্থ হওয়ার পর তিনি যখন বলেন, "সাহেবের উপযোগী অতিথিশালা দরিদ্রের পান্থশালায় পরিণত হইল"[৪] এবং পুরো জমিদারি এলাকায় হরিণ শিকার নিষিদ্ধ করেন, তখন আমরা এক নতুন মানুষের সত্তা প্রত্যক্ষ করি। সময়ের দর্পণ এখানে মানুষের নিষ্ঠুরতাকে প্রতিফলিত করে তাকে পরিশুদ্ধ করার সুযোগ করে দিয়েছে। জলি মারা গিয়েও জমিদারের ভেতরের পশুত্বকে মেরে ফেলে এক উচ্চতর মানবিক বোধ জাগ্রত করেছে। এটিই গল্পের প্রকৃত 'বিলাপ'— যা ধ্বংসের নয়, বরং সৃষ্টির।

অন্যদিকে, ডোরার পরিণতি আমাদের বিদীর্ণ করে। মানুষের তৈরি 'বধ্যভূমি'তে সে বারবার ফিরে যায় তার প্রিয় সখাকে খুঁজতে। ডোরার সেই আঘ্রাণ নেওয়ার আকুলতা প্রমাণ করে যে, পশুর স্মৃতিশক্তি অনেক সময় মানুষের চেয়েও বেশি প্রখর এবং বিশ্বস্ত। ডোরার নিরুদ্দেশ হওয়া গল্পের এক গভীর দার্শনিক সমাপ্তি টানে। সে যেন সেই সমাজের কাছে আর ফিরতে চায়নি, যেখানে বন্ধুত্বের চেয়ে মাংসের স্বাদ বড় হয়ে দেখা দেয়।

এই গল্প আলোচনার অন্তিমে এসেবলাযায়, 'মাংসের বিলাপ' কেবল একটি শিকারের গল্প নয়, এটি হলো সত্তার রূপান্তরের এক মহাকাব্য। সময়ের স্রোতে জলি হারিয়ে গেলেও তার স্মৃতি জমিদারের জীবনধারা বদলে দিয়েছে। কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী এই গল্পের মাধ্যমে আমাদের মনে করিয়ে দেন যে, জগতের প্রতিটি প্রাণের প্রতি মমত্ববোধই মানুষের শ্রেষ্ঠ পরিচয়। মাংসের সেই বিলাপ আসলে আমাদেরই অবদমিত বিবেক, যা বারবার মনে করিয়ে দেয়—অহিংসাই পরম ধর্ম। স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের এই দর্পণে দাঁড়িয়ে 'মাংসের বিলাপ' আমাদের আদিম পাশবিকতাকে বিসর্জন দিয়ে এক পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার পথ দেখায়।

ওড়িয়া ছোটগল্পের বিবর্তনে রাজকিশোর পট্টনায়ক মানুষের অস্তিত্বের গভীরে প্রোথিত থাকা বিষাদ ও সময়চেতনাকে শৈল্পিক রূপ দিয়েছেন। রাজকিশোর পট্টনায়কের অসাধারণ গল্প 'ফাঁকি'। গল্পটি মূলত অস্তিত্ববাদের (Existentialism) একটি ধ্রুপদী উদাহরণ। দার্শনিক মার্টিন হাইডেগারের মতে, মানুষের অস্তিত্ব সবসময় সময়ের সাথে সম্পর্কিত (Being and Time)। এই গল্পে আমগাছটি কেবল একটি উদ্ভিদ নয়, বরং এটি একটি পরিবারের 'অস্তিত্বের নোঙর'। গাছটি যখন উপড়ে পড়ে, তখন সেটি হাইডেগারের ভাষায় 'Dasein' বা জগতের মধ্যে থাকা সত্তার বিলুপ্তি ঘটায়। 'ফাঁকি' গল্পটি শুরু হয় এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের জমি কেনা ও বাড়ি তৈরির স্বপ্ন দিয়ে। কিন্তু সেই জড় কাঠামোর চেয়েও গল্পকারের কাছে মুখ্য হয়ে উঠেছে একটি প্রাণবন্ত আমগাছ। গোপালের বাবার কাছে এই গাছটি ছিল এক দীর্ঘমেয়াদী সাধনা। তিনি যখন বলেন, আগে গাছ লাগাব। তার পরে যত বাগান করবে কর, তখন বোঝা যায় তাঁর কাছে বসতবাড়ির চেয়েও বড় ছিল প্রকৃতির সাথে সখ্য স্থাপন। ভাগলপুর থেকে আনা সেই 'লেংড়া' আমের চারাটি যখন বড় হতে থাকে, তখন সেটি কেবল একটি গাছ থাকে না, হয়ে ওঠে এক 'হৃদয়বান' সত্তা। গাছটি বড় হওয়ার পর তার বর্ণনা দিতে গিয়ে লেখক বলছেন, "সে গাছ আর নাই। ভারী বুদ্ধিমান গাছ ছিল। সেই হৃদয়বান আমগাছটি আর বাঁচিয়া নাই।"[৫] গাছের মৃত্যুতে প্রকৃতির এই মানবিকীকরণ আমাদের সত্তার সাথে জড় ও প্রাণের নিবিড় বন্ধনকেই স্পষ্ট করে।

গাছটির পতন কেবল একটি আকস্মিক দুর্ঘটনা নয়, বরং তা সময়ের এক নিষ্ঠুর পরিহাস বা 'ফাঁকি'। ঝড়ে গাছটি উপড়ে যাওয়ার পর যখন প্রতিবেশীরা বলতে থাকে, "কী ঝড়টা না হয়েছিল, এত বড় ফলন্ত গাছটা উপড়ে পড়ল! আহা! আহা!"[৬], তখন বোঝা যায় একটি পরিবারের ব্যক্তিগত শোক কীভাবে সর্বজনীন হয়ে ওঠে। কিন্তু সবচেয়ে মরমী পর্যবেক্ষণটি হলো যখন দেখা যায়— "গাছটা কত ভাল। পড়িয়াছে যে, তা

ঘরের উপর পড়ে নাই। বাড়ীর উপরকার বিজলী বাতিটা ভাঙ্গে নাই। দিনের বেলা পড়ে নাই।"[৭] এই উদ্ধৃতিটি প্রমাণ করে যে, আমগাছটি মরার মুহূর্তেও তার আশ্রয়দাতাদের ক্ষতি করতে চায়নি। কিন্তু সময়ের অমোঘ নিয়মে সেই স্মৃতিবিজড়িত অস্তিত্ব যখন খণ্ড-বিখণ্ড হয়, তখন সংবাদপত্রের পাতায় তা কেবল একটি শুষ্ক খবর হয়ে ধরা দেয়: "খবর-কাগজে লিখিয়াছিল- কটকে অর্ধরাত্রে ভীষণ ঝড় বৃষ্টি। শহরের ভিতরে পুরীঘাটে আমগাছ উপড়াইয়া পড়িয়াছে।"[৮] এই বাক্যটি দিয়ে লেখক বুঝিয়েছেন, যে স্মৃতির ভার একটি পরিবারের কাছে পাহাড়সম, মহাকালের কাছে তা কেবল এক লাইনের সংবাদ মাত্র।

ওড়িয়া সাহিত্যের দিকপাল কিশোরীচরণ দাসের অন্যতম গল্প 'ভাঙ্গা খেলনা'। গল্পটি সিগমুন্ড ফ্রয়েডের শিশু মনস্তত্ত্ব এবং 'ইডিপাস কমপ্লেক্স'-এর ছায়া ফেলে। গীতর জগতটি ছিল সহজ ও রৈখিক, কিন্তু বড়দের জগতের জটিলতা তার সেই সরলতাকে 'ফ্র্যাগমেন্টেড' বা খণ্ডিত করে দেয়। তাজমহলের মডেলটি এখানে জ্যাক লাকাঁ-র 'মিরর স্টেজ' (Mirror Stage)-এর মতো কাজ করে, যেখানে গীতনিজের সত্তাকে একটি কৃত্রিম সৌন্দর্যের আয়নায় দেখতে পায়। স্মৃতি ও সময়ের এই জটিল সমীকরণ কিশোরীচরণ দাসের 'ভাঙ্গা খেলনা' গল্পে আরও মনস্তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ করে। এখানে দশ বছরের বালিকা গীতর চোখ দিয়ে আমরা দেখি এক বিপন্ন শৈশবকে। বড়দের জগত যে কতটা কৃত্রিম ও আনন্দহীন, তা গীতর ভাবনার মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে: "দশ বছরের মেয়ে। বড়দিনের ছুটির দুপুর, বাড়ীর পিছনের দিকে সিঁড়ির ধাপে বসে চেয়ে আছে রোদের দিকে চিন্তার ছবি বয়ে চলেছে মনের মধ্যে।"[৯] গীতর সরল মনে বড়দের প্রতি এক ধরনের অবিশ্বাসের বীজ উপ্ত হয়েছে, যা তার বাবার আচরণের পরিবর্তনে স্পষ্ট। তার শৈশবের সারল্য যখন বড়দের জটিলতায় পিষ্ট হয়, তখন তার কাছে চারপাশের মানুষগুলোও মেকি মনে হয়। সে ভাবে— "কুলিআটা মিথ্যুক।"[১০]

গল্পের মূল মুহূর্তটি আসে যখন গীত তার বাবার ঘরে একটি নতুন ও দামি খেলনা বা শোপিস দেখতে পায়। ধপধপে সাদা সেই তাজমহলটি দেখে তার মনে হয়— "ধপধপে সাদা। সাদা পাথর না রুপো? সবটা আলো গিয়ে পড়েছে ওর উপরে। কত বড়, কী সুন্দর!"[১১] কিন্তু এই বাহ্যিক সৌন্দর্যের আড়ালে লুকিয়ে আছে এক পরম শীতলতা। গীত যখন সেই মডেলটি স্পর্শ করে, তখন লেখকের ভাষায়— "হাতে কী মোলায়েম লাগছে। ঠাণ্ডা লাগছে। কত টাকা দাম হয়তো।"[১২] এই 'ঠাণ্ডা' লাগার অনুভূতিটি আসলে সম্পর্কের শৈত্য ও বড়দের জগতের প্রাণহীন আভিজাত্যের প্রতীক। তাজমহল নিজেই একটি সমাধি, যা প্রেমের স্মৃতির চেয়েও বেশি মৃত্যুর সাক্ষ্য বহন করে। গীতর হাতে সেই 'ভাঙ্গা খেলনা'র মতো তার শৈশবও যখন উপেক্ষিত হয়, তখন এই দামী উপহারটি কেবল এক নীরব দর্শক হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।

ওড়িয়া ছোটগল্পের বিবর্তনে গোদাবরীশ মহাপাত্র এবং সুরেন্দ্র মহান্তি দুই ভিন্ন সময়ের প্রতিনিধি হলেও তাঁদের উভয়ের লেখনীতেই মানুষ ও তার চারপাশের বৈরী পরিবেশের এক নিপুণ চিত্র ফুটে উঠেছে। গোদাবরীশ মহাপাত্রের 'নীলা মাষ্টারনী' গল্পটি মার্ক্সবাদী ও নারীবাদী তত্ত্বের মিশেলে বিশ্লেষণ করা যায়। সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (Social Stratification) কীভাবে একজন শিক্ষিত মাষ্টারনীকে কেবল তাঁর জীবিকার কারণে

'নিচু জাতের' পরিচয়ে আবদ্ধ করে, তা এখানে মুখ্য। জুডিথ বাটলারের 'পারফরমেটিভিটি' তত্ত্ব অনুযায়ী, নীলা এখানে ধোপানীর ভূমিকা পালন করতে বাধ্য হচ্ছে, যা সমাজ তাঁর ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। আর 'কাঠের ঘোড়া' গল্পটি আধুনিকোত্তরবাদ বা পোস্ট-মডার্নিজমের এক গভীর প্রকাশ। বিজনবিহারী এখানে একজন 'ফ্ল্যানিউর' (Flâneur) বা ভবঘুরে, যিনি বর্তমানের কংক্রিটের ভিড়েও অতীতের সুগন্ধ খুঁজে বেড়ান।

ফ্রেডরিক জেমসন যাকে 'নস্টালজিয়া ফিল্ম' বলেন, বিজনবিহারীর মনটিও ঠিক তেমনি একটি স্মৃতির প্রেক্ষাগৃহ।

'নীলা মাষ্টারনী' গল্পটি আমাদের এমন এক সামাজিক প্রেক্ষাপটে নিয়ে যায় যেখানে মানুষের পরিচয় তার গুণ বা শিক্ষার চেয়ে তার পেশা এবং বংশমর্যাদার ওপর বেশি নির্ভরশীল। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র নীলা, যে একসময় শিক্ষকতা বা 'মাষ্টারনী' হিসেবে তিন গ্রামে পরিচিত ও সম্মানিত ছিল, সময়ের নিষ্ঠুর পরিহাসে তাকে ধোপানীর কাজ বেছে নিতে হয়। এই রূপান্তরটি কেবল পেশার পরিবর্তন নয়, বরং এটি একটি সত্তার অবক্ষয় যা সমাজ চাপিয়ে দিয়েছে। গোদাবরীশ মহাপাত্র এখানে অত্যন্ত তীক্ষ্ণভাবে দেখিয়েছেন যে, সমাজ কীভাবে একজন নারীকে তার প্রতিকূলতায় সাহায্য করার বদলে তাকে নিয়ে ব্যঙ্গ-বিদ্রুপে মেতে ওঠে। নীলা যখন ধোপানী হিসেবে কাপড় কাচতে ঘাটে যায়, তখন তার সেই পুরোনো 'মাষ্টারনী' সত্তাটি কেবল স্মৃতির ধুলোয় ঢাকা পড়ে থাকে। লেখক অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে বর্ণনা করেছেন যে, নীলার পরিচয় এখন তার শিক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং সে কার বাড়ির ময়লা কাপড় পরিষ্কার করছে তার মাধ্যমে নির্ধারিত হয়।

স্মৃতির দর্পণে নীলার জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি হলো তার পারিবারিক বিচ্ছিন্নতা। ভাইয়ের বিয়ের উৎসব যখন শুরু হয়, তখন নীলার সেই অন্তরের বোন বা দিদি সত্তাটি জেগে ওঠে। সে চেয়েছিল তার ভাইয়ের বউয়ের বিয়ের 'চেলী' বা পবিত্র বস্ত্রটি নিজ হাতে পরিষ্কার করতে। এখানে নীলার আকুতি ছিল কেবল কাপড় কাচা নয়, বরং সেই বস্ত্রের মাধ্যমে নিজের হারিয়ে যাওয়া পারিবারিক মর্যাদাকে পুনরুদ্ধার করা। যখন সে বলে, "আমি কেচে দেব লো, আমি কেচে দেব। আমার ভাই বউয়ের চেলী আমায় দাও, আমি কেচে আনব"[১৩], তখন তার কণ্ঠস্বরে পেশাদারিত্বের চেয়ে বেশি ছিল এক বোন হিসেবে ভাইয়ের প্রতি অধিকারবোধ। কিন্তু সমাজ ও তার নিজের ভাই তাকে সেই মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত ছিল। গল্পের শেষে যখন অন্ধকারের মধ্যে ভাই দিদির কাছে আসে এবং নীলা তাকে জড়িয়ে ধরে, তখন সেই অশ্রুভেজা মিলন প্রমাণ করে যে, সামাজিক পদমর্যাদা বা ধোপানীর পরিচয় কোনোটিই রক্তের বন্ধনকে ছিন্ন করতে পারে না। নীলার সত্তাটি এখানে একাধারে লড়াকু এবং মমতাশবলিত, যা সময়ের প্রতিকূলতাকে ডিঙিয়ে নিজের অস্তিত্বের জানান দেয়।

অন্যদিকে, সুরেন্দ্র মহান্তির 'কাঠের ঘোড়া' গল্পটি আমাদের নিয়ে যায় এক বৃদ্ধের মনস্তাত্ত্বিক জগতের গভীরে, যেখানে স্মৃতিই একমাত্র ধ্রুব সত্য। গল্পের নায়ক বিজনবিহারী দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর নিজের শহরে ফিরে আসেন, কিন্তু তাঁর কাছে সবকিছুই অচেনা মনে হয়। তাঁর সত্তাটি গড়ে উঠেছে বিমূর্ত সব অনুভূতির সমন্বয়ে। তিনি যখন ভাবেন, "শৈশবের গন্ধ আছে? তা'হলে তা গোবর-লেপা মাটির বারান্দা আর মধুমালতী ফুল এই দুইয়ের মেশামিশি একটা গন্ধ"[১৪], তখন বোঝা যায় তাঁর কাছে সময় কেবল ঘড়ির কাঁটা নয়, সময় হলো গন্ধ, রঙ আর শব্দের এক মায়ার জগত। বিজনবিহারীর এই যে বিমূর্ত বস্তুর দ্রব্যগুণ নির্ণয় করার 'হবি', তা আসলে যান্ত্রিক বর্তমান থেকে পালিয়ে অতীতের সেই অপাপবিদ্ধ জীবনে ফেরার এক ব্যাকুল চেষ্টা। 'কাঠের ঘোড়া' এখানে এক সচল অথচ প্রাণহীন গতির প্রতীক— যা আধুনিক জীবনকে নির্দেশ করে, যেখানে কোনো আবেগ নেই, আছে কেবল যান্ত্রিকতা।

বিজনবিহারীর এই স্মৃতির জগত বর্তমানের কর্কশ বাস্তবের সাথে ধাক্কা খায় যখন তিনি ট্রেনের কামরায় বা রেস্তোরাঁয় বর্তমান প্রজন্মের মুখোমুখি হন। গল্পের সেই নিষ্ঠুর লোকটি যখন বিজনবিহারীকে "ইডিয়ট" বলে সম্বোধন করে এবং তাঁর সযত্নে কেনা মল্লিকার মালাটি জুতোর তলায় পিষে ফেলে, তখন তা কেবল একটি ফুলের মৃত্যু থাকে না। সেই পিষ্ট হওয়া মালাটি আসলে বিজনবিহারীর সেই সযত্নে লালিত স্মৃতি এবং কোমল সত্তারই এক করুণ পরিণতি। লেখক এখানে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক পৃথিবীতে বিজনবিহারীর

মতো মানুষেরা আসলে এক একজন 'কাঠের ঘোড়া', যাদের ভেতরে প্রাণ আছে কিন্তু বাইরে তারা স্থবির ও অপ্রাসঙ্গিক। মল্লিকার সুগন্ধ তাঁকে যখন সেই স্কুল-বোর্ডিং-এর ভোরের প্রার্থনায় ফিরিয়ে নিয়ে যায়— "অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি মো জীবনস্বামী"[১৫]-র সুর যখন তাঁর কানে বাজে, তখন বর্তমানের নিষ্ঠুরতা সেই পবিত্রতাকে তছনছ করে দেয়। সুরেন্দ্র মহান্তি এখানে বার্ধক্যের একাকীত্বকে এমন এক দর্পণে ফেলেছেন যেখানে অতীত অত্যন্ত উজ্জ্বল কিন্তু বর্তমান অত্যন্ত ধূসর ও মলিন।

এই দুটি গল্পকে একত্রে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, 'নীলা মাষ্টারনী'তে যে লড়াইটি ছিল সামাজিক এবং বাহ্যিক, 'কাঠের ঘোড়া'য় সেই লড়াইটি হয়ে উঠেছে মানসিক এবং অস্তিত্ববাদমূলক। নীলা লড়ছে তার হারানো সম্মানের জন্য, আর বিজনবিহারী লড়ছেন তাঁর হারানো সময়ের স্মৃতির জন্য। উভয় গল্পেই সময় একটি নিষ্ঠুর প্রতিপক্ষ। নীলার ক্ষেত্রে সময় তার পেশা কেড়ে নিয়েছে, তার সম্মান ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছে। আর বিজনবিহারীর ক্ষেত্রে সময় তাঁর চেনা শহর ও চেনা মানুষগুলোকে বদলে দিয়েছে। গোদাবরীশ মহাপাত্রের লেখনীতে যে সামাজিক দায়বদ্ধতা এবং শোষণের চিত্র আছে, সুরেন্দ্র মহান্তির লেখনীতে সেখানে আছে নাগরিক একাকীত্ব এবং আধুনিকতার শূন্যগর্ভ আস্ফালন। 'নীলা মাষ্টারনী'তে চেলী বা বিয়ের কাপড়টি যেমন সম্পর্কের সেতুবন্ধন হয়ে উঠেছিল, 'কাঠের ঘোড়া'য় মল্লিকার মালাটি তেমনি স্মৃতির বাহন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সমাজ যেমন নীলাকে ধোপানী হিসেবে তাচ্ছিল্য করেছে, বর্তমান সময়ও বিজনবিহারীকে 'ইডিয়ট' বলে অবজ্ঞা করেছে।

ওড়িয়া সাহিত্যের এই দুই রত্ন আমাদের অস্তিত্বের গভীরে লুকিয়ে থাকা এক শাশ্বত সত্যকে উন্মোচন করে। আমরা যতই আধুনিক হই না কেন, আমাদের সত্তা সবসময় অতীতে ফেলে আসা স্মৃতি এবং মানুষের সাথে গড়ে ওঠা সম্পর্কের মধ্যেই আশ্রয় খোঁজে। নীলা যখন অন্ধকারের মধ্যে ভাইকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে, তখন সেই কান্না কেবল ব্যক্তিগত দুঃখের নয়, তা সমাজের বিরুদ্ধে এক নীরব বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ। একইভাবে বিজনবিহারী যখন পকেটে থাকা পিষ্ট হয়ে যাওয়া ফুলের গন্ধ অনুভব করেন, তখন তা আধুনিকতার চাপে পিষ্ট হওয়া আমাদের সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলোরই এক প্রতীকী প্রতিবাদ। স্মৃতি-সত্তা ও সময়ের এই দর্পণে দাঁড়িয়ে আমরা বুঝতে পারি যে, 'নীলা মাষ্টারনী' বা 'বিজনবিহারী' কোনো বিচ্ছিন্ন চরিত্র নন— তাঁরা আমাদের সবার ভেতরে থাকা সেই সত্তা, যা হারানো সময় আর বদলে যাওয়া সমাজের মাঝে নিজের আসল পরিচয় খুঁজে পেতে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। এই দুই গল্পের বিস্তারিত পাঠ আমাদের শেখায় যে, জীবন মানে কেবল টিকে থাকা নয়, জীবন মানে সেই স্মৃতিগুলোকে লালন করা যা আমাদের প্রকৃত মানুষ হিসেবে পরিচয় দান করে।

পরিশেষে বলা যায়, এই পাঁচটি গল্পই আমাদের জীবনের এক একটি অধ্যায়কে স্পর্শ করে। রাজকিশোর পট্টনায়ক আমাদের শেখান জীবনের ক্ষণস্থায়িত্ব, কিশোরীচরণ দাস দেখান শৈশবের ভাঙন, গোদাবরীশ মহাপাত্র আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন সামাজিক কাঠিন্যের সাথে, কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী আমাদের বিবেকের দরজায় কড়া নাড়েন এবং সুরেন্দ্র মহান্তি আমাদের একাকীত্বের দর্পণে দাঁড় করান। এই গল্পগুলো ওড়িয়া সাহিত্যের কেবল 'পঞ্চরত্ন' নয়, বরং এগুলো বিশ্ব সাহিত্যের সম্পদ। 'ফাঁকি' গল্পের সেই আমগাছটি যেমন সময়ের কাছে পরাজিত হয়েও 'হৃদয়বান' সত্তার পরিচয় দিয়ে গেছে, তেমনি 'ভাঙ্গা খেলনা'র গীতর অমলিন শৈশব বড়দের কৃত্রিমতার কাছে হেরে গিয়েও এক অব্যক্ত প্রশ্নের পাহাড় তৈরি করেছে। 'নীলা মাষ্টারনী'র লড়াই আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, সামাজিক পরিচয়ের আড়ালে থাকা প্রকৃত সত্তাটি কেবল মমত্বের পরশেই বিকশিত হয়। অন্যদিকে, 'মাংসের বিলাপ' গল্পে আমরা দেখি পশুর বন্ধুত্বের পবিত্রতা কীভাবে মানুষের নিষ্ঠুর সত্তাকে পরিবর্তিত করে এক উচ্চতর নৈতিকতায় পৌঁছে দেয়। স্মৃতির

সরণি বেয়ে এই গল্পগুলো আমাদের যে সত্যের মুখোমুখি করে, তা হলো— সময় বয়ে যাবেই, সমাজ বদলাবে, মানুষ মারা যাবে, কিন্তু আমাদের ফেলে আসা স্মৃতি এবং গড়ে তোলা সত্তাই আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের কাছে এক অমর আখ্যান হিসেবে রয়ে যাবে। এই থিসিসের মাধ্যমে আমরা এটাই উপলব্ধি করি যে, মানুষের জীবন আসলে একটি দীর্ঘ ভ্রমণ, যেখানে প্রতিটি মোড়ে অপেক্ষা করে আছে কোনো না কোনো 'ভাঙ্গা খেলনা' বা 'পিষ্ট হওয়া মল্লিকার মালা', আধুনিক যান্ত্রিকতার বুকে এক দীর্ঘশ্বাস হয়ে রয়ে যায়, যা প্রমাণ করে যে, অনুভূতির জগতকে কোনো বস্তুগত শক্তি দিয়ে মুছে ফেলা সম্ভব নয়।

ওড়িয়া সাহিত্যের এই 'পঞ্চরত্ন' আসলে সময়ের বালুচরে অঙ্কিত এমন এক আল্পনা, যা কালান্তরের ঝড় ঝাপটাতেও ম্লান হয় না। এই গবেষণাপত্রের মাধ্যমে আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, মানুষের জয়গান কেবল তার সাফল্যে নয়, বরং প্রতিকূল সময়ের দর্পণে নিজের মানবিক সত্তাকে চিনে নেওয়ার প্রচেষ্টায় নিহিত। এই পাঁচটি কালজয়ী গল্প পাঠককে সেই ধ্রুব সত্যের পথেই আজীবন পরিচালিত করবে।

তথ্যসূত্র:

১. পঠাণি, পট্টনায়ক (সম্পাদিত)। ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন। নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮০,পৃ. ১৫।
২. তদেব, পৃ. ১৫।
৩. তদেব, পৃ. ২৩।
৪. তদেব, পৃ. ২৩।
৫. তদেব, পৃ. ৬৩।
৬. তদেব, পৃ. ৬৩।
৭. তদেব, পৃ. ৬৩।
৮. তদেব, পৃ. ৬৪।
৯. তদেব, পৃ. ৯৮।
১০. তদেব, পৃ. ৯৮।
১১. তদেব, পৃ. ১০৭।
১২. তদেব, পৃ. ১০৭।
১৩. তদেব, পৃ. ১৩।
১৪. তদেব, পৃ. ৭৮।
১৫. তদেব, পৃ. ৮৬।

গ্রন্থপঞ্জি:

আকরগ্রন্থ:

১. পট্টনায়ক, পঠাণি (সম্পাদিত)। ওড়িয়া ছোটগল্প সংকলন। নয়াদিল্লি, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ১৯৮০

সহায়কগ্রন্থ:

1. Mansinha, Mayadhar. History of Oriya literature. New Delhi, Sahityaakademi, 1960.